বরাভয়

বর্ষাভয়

অলৌকিকের খোঁজে গল্প সংকলন ৪

স ম্পা দ না

অনন্যা ভট্টাচার্য্য

ব ই ব ন্ধু

Borabhoy
Edited by Ananya Bhattacharya

Published by Boibondhu Publications Private Limited
26/2 Surya Sen Street, Kolkata 700009

© Writer

ISBN 978-81-983417-6-1

প্রচ্ছদ : সৌরভ মিত্র
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০২৫

প্রকাশক
বইবন্ধু পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ
২৬/২ সূর্য সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
আলাপন ৮৬১৭৩৮১০৯৫
www.boibondhupub.com

মুদ্রক : মুদ্রণ এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা ৭০০০৫৪

মূল্য : ৫৪৯/-
Price : $13

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ প্রতিলিপি বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শুরুর কথা

"ত্রয়স্ত্রিং শতাস্তবত ভুতান্য শাম্যন্ প্রজাপতিঃ। পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীত্..."

অর্থাৎ যাঁর প্রভাবে গতিশীল প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রজাপালক, সর্বব্যাপক, অন্তরীক্ষে ব্যপ্ত, তাঁহার মহাভূতের তেত্রিশ প্রকার গুনের স্তুতি কর।

সনাতন ধর্মের তেত্রিশ প্রকার বা তেত্রিশ কোটি দেবদেবী সম্ভবত এই ভাবনাকেই স্বীকৃত করে।

শুরুর কথা বরং শুরু করা যাক সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে। পিছিয়ে যাই সেই যুগে যখন জীবন ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা, সংশয়ের কালো মেঘ প্রতি মুহূর্তে সভ্যতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করত। জীবনসংগ্রামে লড়াই করে বাঁচার অদম্য প্রচেষ্টায় আমাদের পূর্বসূরিরা আশ্রয় পেতে চেয়েছিল কোনও অলৌকিক পরিচালক শক্তির কাছে, প্রার্থনা করেছিল দৈব অনুগ্রহের।

তাদের ভাবনাকে আশ্রয় করে নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত-গাছপালাকে ঘিরে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দেব দেবীর, যাঁদের সন্তুষ্টিবিধানে মিলবে শস্য, সম্পদ আর সন্তান, মিলবে বরাভয়, কেটে যাবে জীবনের অনিশ্চয়তা।

এরপর কালের নিয়মে সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে। মানুষের বিশ্বাস আরও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এসেছে বৈদিক যুগ।

ঋগবেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে,

আমি"একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

অর্থাৎ এক, অখণ্ড ও চিরন্তন ব্রহ্মকে বিপ্রগণ বহু নামে বর্ণনা করেছেন।

দেব শব্দটির উৎপত্তি "দি" ধাতু থেকে যাকে স্ত্রীলিঙ্গে দেবী বলা হয়। দি ধাতুর অর্থ "প্রকাশ পাওয়া"। তাই বলা হয়েছে যিনি প্রকাশ পান, যিনি ভাস্বর, তিনিই দেবতা। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদের ওপর ভিত্তি করে "পুরাণ" গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছে যেখানে দেবদেবীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. বৈদিক দেবতা

২. পৌরাণিক দেবতা এবং

৩. লৌকিক দেবতা।

এরমধ্যে তৃতীয় ভাগ অর্থাৎ লৌকিক দেবদেবীদের বিভিন্ন প্রচলিত, অপ্রচলিত ও কাল্পনিক গল্পগাথা নিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের এবারের সংকলন অর্থাৎ "অলৌকিকের খোঁজে" সাহিত্যপরিবারের চতুর্থ সংকলন "বরাভয়"।

বেদে ও পুরাণে যে-সকল দেবতার কথা বলা হয়নি, কিন্তু ভক্তগণ তাঁদের পূজা করেন, তাঁদের বলা হয় লৌকিক দেবতা। যেমন— মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি।

লৌকিক দেবদেবীদের মাহাত্ম্য, তাদের আখ্যান এবং পাশাপাশি বিভিন্ন অপদেবতার পূজাঅর্চনাকে ঘিরে তৈরি হওয়া কিছু বাস্তব ও কাল্পনিক পটভূমিকাকে কেন্দ্র করে ষোলটি ভিন্ন স্বাদের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে আমাদের এবারের সংকলন। অলৌকিকতার বিভিন্ন ডাইমেনশনকে ছুঁয়ে দেখার এই প্রয়াস পাঠকদের মন জয় করবে এই আশা রাখি।

এই আনন্দঘন মুহূর্তে, "অলৌকিকের খোঁজে" সাহিত্যপরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই "বইবন্ধু প্রকাশনা সংস্থা"কে এই উদ্যোগে পাশে থাকার জন্য। একরাশ ভালোবাসা জানাই সাহিত্যপরিবারের সকল সদস্যদের, সংকলনের সকল কলমচিদের এবং এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত সকলকে। সবশেষে বলি, "অলৌকিকের খোঁজে"-র প্রথম তিনটি সংকলনের মতো চতুর্থ সংকলনটিকেও পাঠকরা আপন করে নিলে পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

ধন্যবাদান্তে,
অনন্যা ভট্টাচার্য্য
সম্পাদিকা

সূচিপত্র

ঘাগর চণ্ডী ◆ দীপান্বিতা রায় ◆ ৯

থাকে শুধু অন্ধকার ◆ মানসী রায় চট্টোপাধ্যায় ◆ ১৮

শাপমোচন ◆ সুদীপ্ত কাহালি ◆ ৪০

বেহুল রাঢ়ির ঝি ◆ শ্রীময়ী চক্রবর্ত্তী ◆ ৬৫

গোকুলচাঁদ মন্দিরের দেবদাসী ◆ পৌলমী গঙ্গোপাধ্যায় ◆ ৭৮

অরণ্য জেগে আছে ◆ চন্দ্রানী ভট্টাচার্য্য ◆ ৯৭

পরিত্রাণায় ◆ কৌশিক কারক ◆ ১২৭

উপাসিকা ◆ হৈমন্তী ভট্টাচার্য ◆ ১৪৯

দেউল ◆ কল্যাণ গুপ্ত ◆ ১৬৮

নাট কানাটের থান ◆ অমৃতা ঘোষ ◆ ১৯৪

আউরোল রাধা ◆ মুম্মা মিত্র ◆ ২০৫

শুভ অশুভ ◆ সুতপা মন্ডল ◆ ২১৯

কোয়াঠ ◆ অমিত সিংহ ◆ ২৪২

দেবী যখন প্রেয়সী ◆ সুতপা সোঽহং ◆ ২৫৬

গুলমোহরের মাসানবাবা ◆ সুলগ্না ব্যানার্জ্জী ◆ ২৬৮

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু ◆ সুতপা ভদ্র সরকার ◆ ২৮৬

লেখক পরিচিতি ◆ ৩০৮

ঘাগর চণ্ডী

দীপান্বিতা রায়

মধ্যরাত। গ্রামের রাস্তা শুনশান। মাঝে-মধ্যে দু-একটি কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। গ্রামবাসীরা সকলেই নিজ নিজ গৃহে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গ্রামের উপান্তে একটি কুটির, কুটিরে ভিতরে মৃদু প্রদীপশিখার আলো দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকে অবশ্য সে আলো চোখে পড়বে না। পাকশালের এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বলছে, উনুনের পাশে বসে রয়েছেন দীর্ঘকায় একজন মানুষ। তাঁর সামনে একটি বাঁশের চাটাইয়ের ওপর রাখা আছে কয়েকটি পাতলা চৌকো মাটির পাত। পাতগুলির ওপর কিছু লেখাও আছে। মানুষটি সেই পাতগুলি হাতে তুলে নিয়ে একবার ভালো করে পড়লেন, তারপর সেগুলি সাবধানে একটি সাঁড়াশি দিয়ে ধরে উনুনের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন।

যখন উনুনের ছাই টেনে এনে পাতগুলির ওপর চাপা দিচ্ছেন, সেই সময় পাকশালার দরজায় এসে দাঁড়ালেন এক নারী। শ্যামবর্ণা। মাথার ঘন কালো চুলে খোঁপা বাঁধা। টানা টানা সুন্দর চোখ।

রণক, রাত্রি অনেক হল। এবার শুতে চল।

সৌরক কী করছে?

সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমানুষ, কতক্ষণই বা রাত জাগতে পারে।

"এখানে বোসো শৈলী। হাতের কাজ শেষ হলেই শুতে যাব, কিন্তু তার আগে তোমাকে কয়েকটি জরুরি কথা বলে নিতে চাই। এই সপ্তপুর গ্রামে থাকা যে আমাদের পক্ষে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছে সেটা তো তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ। আমরা বুদ্ধের উপাসক, কিন্তু আমাদের রাজা ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই স্বীকৃতি দেন। তিনি "ত্রিদেব মানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের" উপাসক। তাতেও কিছু অসুবিধা ছিল না। রাজার ধর্ম নিয়ে প্রজারা মাথা ঘামায় না, কিন্তু যা খবর পাচ্ছি রাজা একেবারেই পরধর্মসহিষ্ণু নন। তিনি সিংহাসনে বসার পর থেকেই সারা দেশজুড়ে ব্রাহ্মণদের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। অন্যধর্মের মানুষদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়েছে। ওদন্তপুরীর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নাকি নানাভাবে অপমান করা হচ্ছে। বিক্রমশীলা বিহার যে রাজ অনুগ্রহ পেত, তা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। সংঘের ভিক্ষুরা নিতান্তই দুরাবস্থায় আছে। অনেক ভিক্ষু নাকি চলেও গেছেন।

"এসব খবর তুমি কার কাছে শুনলে?

আগে থেকেই নানা কথা কানে আসছিল। কিন্তু সুরপতি সম্প্রতি নগরে গেছিল। তার কাছে যা শুনলাম তা তো অতি ভয়ানক। রাজার সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা নাকি তথাগতের অনুগামীদের ওপর গ্রামে গ্রামে গিয়ে অত্যাচার শুরু করেছে। নিম্নবর্ণের মানুষ যাঁরা বুদ্ধের শরণ নিয়েছিল, তাদের ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করছে। কেউ রাজি না হলে তাকে হত্যা করা হয়েছে এমন ঘটনাও ঘটেছে।

"কী সর্বনাশ! তারা তো তাহলে এই সপ্তপুরেও আসতে পারে।

স্ত্রীর ভীত, স্বন্ত্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিষাদে মন ভরে গেল রণকের। কিন্তু কিছু করার নেই। মিথ্যা স্তোকবাক্য তিনি দিতে পারবেন না। তাই ভারাক্রান্ত গলায় বললেন,

"আমারও সেইরকমই আশঙ্কা। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে শৈলী।

"কীসের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে স্বামী?

এই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য। প্রাণ থাকতে আমি তথাগতর শরণ থেকে চ্যুত হতে পারব না, তাই বেঁচে থাকতে হলে পালিয়ে যেতে হবে।

"পালিয়ে কোথায় যাব আমরা?

"এখনও সবটা জানি না। রাঢ় বঙ্গের বেশ কিছু অংশ এখনও ঘন জঙ্গলে ঢাকা। সেখানে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন বাস করে, তারা তাদের নিজস্ব ধর্ম নিয়ে থাকে। অন্যের ধর্মে নাক গলায় না। বল্লাল সেনের সৈন্যরাও ওই ঘন জঙ্গল পেরিয়ে হানা দেওয়ার কথা সহজে ভাববে না। সেক্ষেত্রে ওখানেই হতে

পারে আমাদের নতুন ঠিকানা।

"কিন্তু সে পথ তো খুব দুর্গম স্বামী!

"হ্যাঁ, সেতো নিশ্চয়। জঙ্গলের ভিতরে নানারকম শ্বাপদও আছে, আমাদের সাবধানে যেতে হবে। তবে আমরাও তো একলা থাকব না। সুরপতি আর তার পরিবার তো যাবেই। এছাড়াও আর কিছু মানুষ যাবে। সবাই যে সপ্তপুরের বাসিন্দা তাও নয়। কেতুগ্রাম, সুরখালিরও কিছু মানুষ আছে। ভগবান তথাগতর শরণ নিয়ে তারা সকলেই ঘর ছাড়বে। একসঙ্গে থাকলে ভয় কম থাকে।

শৈলীর এবার চোখ পড়ে স্বামীর সামনে রাখা জিনিসপত্রগুলির ওপর।

ক'দিন ধরেই তুমি এই মৃত্তিকা পাত্রের মতো জিনিসগুলি তৈরি করছ দেখছি...

হ্যাঁ। এগুলিও রাজপ্রহরীদের চোখ এড়ানোরই প্রস্তুতি বলতে পার। এই যে মৃত্তিকার পাতগুলি তৈরি করেছি, এর ভিতর বুদ্ধের বাণী লেখা আছে। মৃত্তিকা দিয়ে কবচ বানিয়ে রেখেছি। তার ভিতর এই পাতগুলি পুরে মুখ বন্ধ করে দেব। কবচের ওপর শঙ্খ আর ত্রিশূল এঁকে দিয়েছি। এগুলি হল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতীক। তাই কবচ হাতে পরে থাকলে রাজপ্রহরীরা কিছু বুঝতে পারবে না। কিন্তু তথাগতর বাণী আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমাদের দলের প্রত্যেকের হাতে থাকবে এই কবচ, যাতে কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও আমরা পরস্পরকে চিনে নিতে পারি।

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগ। বাংলার রাজা বল্লাল সেন। তার বহু আগে, মৌর্য রাজাদের সময় থেকেই বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল। এরপর গুপ্ত যুগেও কিন্তু বাংলায় বৌদ্ধদের কোনও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ গুপ্তরাজারা শিবের উপাসক হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁদের কোনও বিরাগ ছিল না। এরপর গৌড়বঙ্গের রাজা হন শশাঙ্ক। তিনি ছিলেন শিবের উপাসক। তবে শশাঙ্ক সুশাসক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বৌদ্ধরা কোনওরকম রাজ অনুগ্রহ না পেলেও তাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা সাধারণত ঘটত না। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দীর্ঘসময় বাংলা শাসন করেন পাল রাজারা। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের উপাসক। পাল রাজত্বকালেই ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা বিহার তৈরি হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা সেখানে আসতেন। পাল বংশের শেষ রাজা রামপালের মৃত্যুর পর ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন। কট্টর হিন্দু রাজা বল্লাল সেন রাজ্য শাসন শুরু করার পরেই বৌদ্ধদের ওপর আক্রমণ নেমে আসতে থাকে। এই কাহিনি শুরু হচ্ছে রাজা বল্লাল সেন

সিংহাসনে বসার বছর পাঁচেক পরে।

রণকের অনুমান যে নির্ভুল ছিল তা বোঝা গেল কয়েকদিনের মধ্যেই। খবর পাওয়া গেল সেন রাজাদের সৈন্যরা জগদ্দলা, পণ্ডিতা, দেবীকোটার মতো বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো বিহারে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। যে কোনও দিন তারা নদী পেরিয়ে সপ্তপুরায় হানা দিতে পারে। কারণ তাদের কাছে খবর আছে সপ্তপুরা থেকে অল্প দূরে ফুললহরী বিহারে এখনও বেশ কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু রয়েছে।

খবর পাওয়ার পর আর দেরি করতে রাজি হলেন না রণক। শৈলী আর সৌরককে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কুটিরে যে সামান্য কিছু জিনিসপত্র ছিল তাও ফেলে আসতে হল।কারণ দীর্ঘ পথ হাঁটতে হবে। ভার বহন করা সম্ভব নয়। শুধু সামান্য কিছু খাদ্য বস্তু আর পোশাক সঙ্গে নেওয়া হল। সুরপতিকে খবর দেওয়া ছিল আগেই। ভোর রাতে, যখন আকাশে আলো ফোটেনি, শুধু তারাদের ঔজ্জ্বল্য সামান্য ম্লান হয়ে এসেছে, তখন গ্রামের প্রান্তে একটি বিশাল বটগাছের তলায় মিলিত হল সকলে। রণকদের নিয়ে মোট সাতটি পরিবার। রওনা দেওয়ার আগে একবার আধো-অন্ধকারে ঢাকা সপ্তপুরা গ্রামের দিকে তাকালেন রণক। তাঁর পিতৃ-পিতামহের বাসস্থান। বাল্য-কৈশোর কাটানো নিশ্চিন্ত গৃহ। নাঃ, আর অপেক্ষা করা ঠিক নয়। আলো ফুটলে গ্রামের মানুষজনের ঘুম ভাঙবে। মন শক্ত করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন রণক।

দীর্ঘ পথ। তিনদিন, তিনরাত চলছেন তারা। রাতে গাছতলায় বিশ্রাম। তার আগে আগুন জ্বেলে সামান্য একটু তণ্ডুল ফুটিয়ে নেওয়া। বনের মধ্যে পাকা ফল দেখলে সংগ্রহ করেন তারা। ঝরণার জল পাওয়া যায়। একটাই ভরসার কথা জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র শ্বাপদ খুব বেশি নেই। মাঝে-মধ্যে ভালুকের দেখা মেলে। তবে তারা মানুষ দেখলে দূরে সরে যায়। বরং বন্য বরাহের ভয় বেশি। তবু রণকের কড়া নির্দেশ, রাতে চারধারে আগুন জ্বেলে তার ভিতরে বুহ্য রচনা করে থাকবে সবাই। এখনও পর্যন্ত তাঁরা যতটা পথ এসেছেন, তাতে লোকালয় আছে মাঝে-মধ্যে। কিন্তু রণক লোকালয়ের দিকে যেতে নিষেধ করেছেন। অচেনা মানুষ দেখলেই মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে যাবে। তাঁরা যে সপ্তপুরা ছেড়ে চলে এসেছেন, এ কথা এতদিনে সবাই জেনে গেছে। সুতরাং রাজার প্রহরীদের কানে উঠতেও বেশি দেরি হবে না, সেক্ষেত্রে নিজেদের অস্তিত্ব অন্যদের জানতে না দেওয়াই ভালো।

অচেনা জায়গা সম্বন্ধে রণকের আগ্রহ ছোটোবেলা থেকেই। গ্রামে নতুন কেউ এলেই তার কাছে গিয়ে জানতে চাইতেন সে কোথা থাকে এসেছে। পর্যটকদের

কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পথের খোঁজ নিতেন। ভবঘুরে সন্ন্যাসীদের কাছে জানতে চাইতেন গ্রামের ওপারে জঙ্গলের শেষে কী আছে। এমনকী ফুললহরী সংঘের ভিক্ষুকদের কাছেও অনেক অজানা জায়গার গল্প শুনেছেন রণক। তাই তাঁর জানা ছিল, এখন যে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাঁরা যাচ্ছেন সেই বনভূমি শেষ হলে একটি নদী পাওয়া যাবে। ইতস্তত বয়ে যাওয়া ঝোরা নয়, বড়ো নদী। তার ওপাশে আর লোকালয় নেই, ঘন জঙ্গল। নদীর ওপারে কী আছে কেউ বলতে পারেনি। শুধু এক সন্ন্যাসী রণককে বলেছিলন, জঙ্গলের ভিতর আর গ্রাম নেই ঠিকই, কিন্তু আদিবাসীদের ছোটো ছোটো বসতি আছে। তারা বনে থাকে, বন্য পশু মেরে খায়, তাদের জীবনযাত্রা নগর-গ্রামের মানুষের থেকে একদম আলাদা। তবে তারা ভারী অতিথিবৎসল। হিংস্র স্বভাবের নয় মোটেই, সরল, সাদাসিধে মানুষ। ওই ঘন জঙ্গলের ভিতর সাতটা ছোটো ছোটো নদী আছে আর সেই নদীগুলির কাছেই আছে আদিবাসী বসতি।

রণক ঠিক করেছিলেন যেমন করে হোক ওই আদিবাসী বসতিগুলি খুঁজে বার করতে হবে। এত গভীর অরণ্যে রাজার প্রহরীরা সহজে আসবে না। তাই এখানে আশ্রয় পেলে তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

পাঁচদিন চলার পর অবশেষে রণক এবং তাঁর দলবল সেই নদীর ধারে এসে পৌঁছলেন। মস্ত বড়ো নদী। তবে গ্রীষ্মকাল, তাই জল শুকিয়ে গেছে অনেকটাই। শুকনো চরে শালিকের দল ঘাসের বীজ খুঁটে খাচ্ছে। নৌকার কোনও প্রশ্ন নেই। সাঁতরে পেরোতে হবে নদী। দলের দুজন বয়স্ক মানুষকে নদী পার হতে সাহায্য করলেন রণক আর সুরপতি। বাকিদের অবশ্য অসুবিধা হয়নি। নদী পেরিয়ে ওপারে একটি গাছের তলায় বসে রণক বললেন,

"এবার আমরা ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাব। কিন্তু সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে কোথায় জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে, কোথায় ছোটো নদী আছে। সেই নদী বরাবর আমাদের যেতে হবে। সন্ন্যাসীর কাছে আমি জেনেছি, নদীর ধারে আদিবাসী বসতি আছে। সেরকম কোনও বসতির দেখা মিললেই একটি করে পরিবার সেখানে আশ্রয় নেবে। বাকিরা আবার পথ চলতে শুরু করবে। যারা আশ্রয় পাবে, তারা ওই বসতির মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। আদিবাসীরা প্রকৃতির উপাসক। অন্য ধর্মের সঙ্গে তাদের কোনও বিরোধ হয় না বলেই শুনেছি। তবু নিজেদের পরিচয় গোপন রাখবে। একান্তে বসে মন্ত্রোচ্চারণ করে তথাগতের আরাধনা করবে। কেউ যেন সন্দেহ না করে। তোমাদের হাতে যে কবচ বাঁধা আছে, তাতে বুদ্ধের বাণী লেখা আছে। যখন আবার আমাদের সুদিন আসবে,

তখন ওই মাটির পাত বার করে তার ওপর স্তূপ রচনা করবে। আর তা না হলে নিজের সন্তান-সন্ততিকে ওটি দিয়ে যাবে।

আবার শুরু হল পথচলা। ক্রমশ দল থেকে কমতে শুরু করল একটি করে পরিবার। সকলের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে শেষপর্যন্ত সৌরক আর শৈলীর হাত ধরে রণকও এসে দাঁড়ালেন নদীর ধারে আদিবাসীদের এক বসতিতে। আশ্রয় মিলল সেখানে। জানা গেল এই নদীর নাম নুনিয়া। এখানকার মানুষজন তাকে আদর করে ডাকে নুনিয়া বুড়ি। তালপাতার ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে কয়েকটি পরিবারের বাস। চাষ-বাস তারা জানে না। জঙ্গলের ওপর নির্ভর করেই চলে তাদের জীবন। আর ওই নুনিয়া নদীর ধারে, গাছের নীচে রয়েছে কয়েকটা বড়ো নুড়ি পাথর। সেগুলোই তাদের দেবতা। ঝড়, বৃষ্টি, বাদলা বেশি হলে, বনে আগুন লাগলে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবতার পুজো করে তারা। ফল-মূল, বনের পাখি উৎসর্গ করা হয়। তারপর হয় নাচ-গান। একেবারেই অনভ্যস্ত জীবন। তবু রণক, শৈলী এবং সৌরককে নিয়ে থাকতে শুরু করলেন সেখানে। ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগলেন তাদের জীবনের সঙ্গে। আদিবাসী মানুষরা তাদের আশ্রয় দিলেও প্রথমদিকে একটু দূরত্ব বজায় রাখত, কিন্তু ক্রমশ সেই ব্যবধান ঘুচে গেল। বিশেষত সৌরক আর শৈলীর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল সবার। রণক নিজের গ্রামে থাকতে কবিরাজী করতেন। বহু লতা-পাতা-গুল্ম-শিকড় তাঁর চেনা। এখানেও তিনি বন থেকে সেসব সংগ্রহ করে নিয়ে আসতেন। তাঁর চিকিৎসায় দু-একজন সুস্থ হয়ে ওঠায় বসতির মানুষরা তাঁকে রীতিমতো সম্ভ্রমের চোখে দেখতে শুরু করল।

এভাবেই কেটে গেল বেশ কয়েকটা বছর। রণক ধীরে ধীরে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এরমধ্যে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একদিন তাঁদের বসতির কয়েকজন জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে দেখে একটি মানুষ অজ্ঞান হয়ে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। মাথায়-পায়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে। সারা শরীরে রক্তের দাগ। তারা মানুষটিকে তক্ষুণি ধরাধরি করে নিয়ে আসে। রণক দেখেই বুঝতে পারেন যে মানুষটি অসুস্থ। অসুস্থ থাকার কারণেই সে সম্ভবত পড়ে গেছিল এবং তার ফলে মাথায় এবং পায়ে আঘাত লেগে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তিনি তক্ষুণি তার পরিচর্যা শুরু করেন। তবে রণক এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে অসুস্থ লোকটি ব্রাহ্মণ, কারণ তাঁর গলায় উপবীত আছে। স্ত্রী এবং পুত্রকে তিনি বারণ করে দিয়েছিলেন এর সামনে কোনওভাবেই নিজেদের পরিচয় যেন তারা না জানায়।

অসুস্থ মানুষটিকে নিজের কুটিরেই রেখেছিলেন রণক। রাত জেগে তাঁকে ওষুধ খাওয়াতেন। প্রতিদিন ক্ষতস্থান ধুয়ে সেখানে নতুন করে প্রলেপ লাগাতেন। পথ্য তৈরি করে দিত শৈলী। দুদিন পরে জ্ঞান ফিরল মানুষটির। একটু একটু করে সেরে উঠতে লাগলেন। তখনই জানা গেল, রণকের অনুমান ঠিক তিনি ব্রাহ্মণ। নাম কাঙাল। জানা গেল নিজের কয়েকজন আত্মীয় এবং গ্রামবাসীর সঙ্গে জঙ্গলের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন কাঙাল। পথে প্রবল জ্বরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর সঙ্গী-সাথীরা কেউ তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি। অসুস্থ অবস্থায় হাঁটতে গিয়ে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পান কাঙাল। তারপর আর কিছু তাঁর মনে নেই।

প্রাণ বাঁচিয়েছেন বলে রণকের প্রতি কাঙালের কৃতজ্ঞতা তো ছিলই। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠার পর ক্রমশ তাঁদের দুজনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্কও গড়ে উঠল। রণক বুঝতে পারছিলেন কাঙাল মানুষটি সরল এবং উদারমনের। মূর্খও নয়। চতুষ্পাঠীতে পড়াশোনাও করেছেন। তবে তিনি নিজে সর্বদা তাঁর পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে কাঙাল যাতে কিছু জানতে না পারেন সে বিষয়ে সাবধান থাকতেন। কিন্তু একদিন রণক ধরা পড়ে গেলেন কাঙালের কাছে। আদিবাসী জনজাতির যে পূজার্চনা তাতে অংশ নিতেন রণক, কিন্তু প্রতিদিন সূর্যাস্তের আগে জঙ্গলের ভিতরে কোনও একটি নির্জন গাছের নীচে বসে তথাগতকে স্মরণ করতেন। কাঙাল যে সেটি লক্ষ্য করেছে, তিনি বুঝতে পারেননি। একদিন প্রার্থনা শেষ করে রণক যখন নদীর ধারে পাথরের ওপর বসে আছেন তখন কাঙাল এসে তার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলেন,

তোমার ঈশ্বর কে রণক? তুমি কার উপাসনা করো? এই আদিবাসী জনজাতিরা যে তিনটি পাথরকে তাদের দেবতা বলে মনে করে, তারা যেভাবে অগ্নি, জল আর বাতাসের আরাধনা করে, তুমি তো তা করো না। তোমরা যে এই গোষ্ঠীর মানুষ নও, সেটা আমি বুঝেছি, কিন্তু তোমাদের পরিচয় কী?

রণক বুঝলেন যে তিনি ধরা পড়ে গেছেন। কিন্তু ততদিন কাঙালকে তিনি অনেকটা চিনে ফেলেছেন। কাঙাল যে সহজে তার ক্ষতি করবে না তাও বুঝেছেন। তাই বন্ধুকে তিনি খুলে বললেন নিজের অতীতের কথা, কেন তিনি পরিবার নিয়ে এই আদিবাসী বসতিতে আত্মগোপন করে আছেন তাও বললেন। সবকথা শুনে আতঙ্কিত হলেন কাঙাল,

রণক তুমি জানো না গত কয়েক বছরে বঙ্গভূমের পরিস্থিতি বৌদ্ধদের জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। সিংহাসনে এখন বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন। সারা

দেশ জুড়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। তোমার কাছে লুকোব না। আমি আর আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরাও যাচ্ছিলাম রাজ অনুগ্রহ লাভের আশায়। খবর পাওয়া গেছে এই জঙ্গলের প্রান্তে যে নদী আছে, তার ধারে শিবির তৈরি করেছে রাজার সেনানী। সেখানে যাওয়াই ছিল আমাদের লক্ষ্য।

কিন্তু তাহলে তো তারা নদী পেরিয়ে এই জঙ্গলেও প্রবেশ করতে পারে?

প্রবেশ করাই তাদের উদ্দেশ্য। রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁর রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করতে চাইছেন।

কিন্তু কাঙাল সেক্ষেত্রে আমাদের তো এখানে থাকাও আর নিরাপদ নয়...

ভয় পেয়ো না বন্ধু। তুমি আজ সবকথা খুলে বলে খুব ভালো করেছো। আমি যখন জঙ্গলে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তখন আমার স্বজনরা আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু এই নিতান্ত অনাত্মীয় আদিবাসী মানুষরা আমাকে তুলে নিয়ে আসে। তোমার চিকিৎসায় আমি বেঁচে উঠি। তোমাদের কোনও ক্ষতি আমি হতে দেব না। চিন্তা কোরো না উপায় একটা বেরোবেই। এই জায়গা ছেড়ে তুমি যাওয়ার চেষ্টা কোরো না। কারণ এই জঙ্গল বহুদূর বিস্তৃত। ক্রমশ অরণ্য আরও গভীর হয়েছে। পশ্চিম দিকে যত যাবে হিংস্র শ্বাপদের সংখ্যাও তত বাড়বে।

কাঙাল নানাভাবে তাঁকে আশ্বস্ত করলেও রণক কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। অথচ তাঁর কিছু করারও নেই।

অল্পদিনের মধ্যেই কাঙালের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল। একদিন ভরা দুপুরে রাজার সেনাবাহিনী ঘিরে ফেলল আদিবাসী বসতি। সেনা আসছে খবর পেয়ে পুরুষরা অধিকাংশ জঙ্গলে পালিয়েছিল। কুটিরে ছিল শুধু মেয়েরা আর শিশুরা। প্রধানের আদেশে সেনারা কুটিরগুলি ভেঙে দিতে উদ্যত হতেই কাঙাল এগিয়ে গেল,

আমাদের অপরাধ কি প্রভু, কেন আমাদের এই সামান্য বাসস্থান আপনি ধ্বংস করে দিচ্ছেন?

রাজার আদেশ। ত্রিদেবের পূজারী যারা নয়, তাদের বঙ্গদেশে কোনও স্থান নেই।

কিন্তু প্রভু আমি ব্রাহ্মণ, এই দেখুন আমার উপবীত। এই বসতির সব মানুষ আমার কাছে দীক্ষিত। আমি তাদের মন্ত্র দিয়েছি।

কাঙালের কথায় সামান্য থমকে যান সেনাপতি। কিন্তু তারপর রূঢ় স্বরে বলেন,

তা কীকরে হবে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি এই সব পাথরের গায়ে সিঁদুর লেপেছে। এসবই তো অনার্য, আদিবাসীদের পূজার পদ্ধতি।